
সর্পদেবীর গুহা
অনিল ভৌমিক

প্রথম প্রকাশ

শুকতারা শারদীয়া ১৩৯২

বৈদ্যুতিন প্রকাশক

https://kheladhulo.blogspot.com

পরিকল্পনা -সুজিত কুন্ডু ০ রূপায়ন -স্নেহময় বিশ্বাস

সর্প-দেবীর গুহা

অনিল ভৌমিক

ভ্যানকুয়ার দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তের বন্দর ভিক্টোরিয়া। সেই বন্দর-শহরে তখন রাত গভীরের দিকে। রাস্তার ধারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। কয়েকটা রেস্তোরাঁ তখনও খোলা আছে। রেস্তোরাঁয় লোকজনের ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। অন্ধকারে বাড়ির ছাদের মাথায় নানারঙের নিয়ন আলো জ্বলছে। কিছু নিয়ন আলো জ্বলছে নিভছে। কত জিনিসের প্রচার করছে এসব—সাবান, চা, কোকো, সিগারেট। নিয়নের আলোর নানা রঙ পড়ছে রাস্তায় বাড়ির দেয়ালে, পথচলতি লোকজনদের গায়েও ছড়াচ্ছে। বিচিত্র বর্ণের এই আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসছিল ফ্রান্সিস। সমুদ্রের ধারে প্রিন্স রুপার্ট হোটেলে তার আস্তানা। আজ রাতে আর হোটেলে খাবে না। এক বিলাসবহুল হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছে। এখন একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বড় কাপের এক কাপ কফি খাবে। তারপর নিজের হোটেলে ফিরে যাবে।



মোড়ের কাছাকাছি এসে একটা রেস্তোরাঁ পেল। তখনও খোলা। লোকজনেরও ভিড় কম। রেস্তোরাঁয় ঢুকে পিটার দেখল যে এখানে ওখানে লোকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। কোণার দিকে একটা টেবিলে দেখল একজন মাত্র লোক বসে রয়েছে। পিটার সেই বেঞ্চটার সামনে লোকটার পাশে বসল। বেয়ারা আসতে এক কাপ কফির অর্ডার দিল। তারপর পা ছড়িয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল। আড়চোখে একবার পাশের লোকটাকে দেখল। রোগা চেহারা লোকটার। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনের শার্ট ট্রাউজার নোংরা কোঁচকানো। কতদিন কাচা হয় নি মা মেরীই জানে। গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে লোকটা। একটা জিনিস লক্ষ করল পিটার। কেমন ভীতমুখে মাঝে মাঝে লোকটা দোকানের দরজার দিকে তাকাচ্ছে। দোকানে যে ঢুকছে তাকেই চোখ পিটপিট করে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। তারপর যেন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার গোগ্রাসে খাবার গিলছে। যেন কতদিন খায় নি।

বেয়ারা কফি দিয়ে গেল। পিটার ধীরে সুস্থে চুমুক দিতে লাগল কফির কাপে।

হঠাৎ পাশের লোকটা উঠে দাঁড়াল। ওর চোখে মুখে আতঙ্ক। পিটার দেখল দোকানের দরজা দিয়ে একটা লোক ঢুকে চারদিকে তাকাচ্ছে। তার ডান হাতটা প্যান্টের পকেটে ঢোকানো। লোকটার ভারি চোয়াল। চোখ দুটো ছোট ছোট। কিন্তু চোখের দৃষ্টি তীব্র। মুখে সরু গোঁফ। মাথার চুল বড় বড়। পাট করে আঁচড়ানো। ষণ্ডা মতো চেহারা লোকটার। পিটারের পাশে বসা রোগাটে চেহারার লোকটা তখন বসে পড়ে টেবিলের তলায় লুকোবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারল না। ষণ্ডা মতো লোকটা ততক্ষণে ওকে দেখে ফেলেছে। এক লাফে এগিয়ে এসে লোকটা দ্রুতহাতে প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তল বের করল। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গপ্ করে একটা শব্দ হলো। গুলি ছুটল। গুলি লাগল রোগা লোকটার বাঁ কাঁধে। লোকটা টেবিলের নিচে গড়িয়ে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। পিটার কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। কিন্তু ষণ্ডামত লোকটাকে দ্রুত এগিয়ে আসতে দেখেই পিটার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল লোকটাকে ঠেকাতে হবে। ষণ্ডামত লোকটা তখন টেবিলের সামনে। পিটার মুহূর্তে দু পা টেবিলের কোণায় ঠেকিয়ে লাথি মারল। টেবিলটা উল্টে গেল। ষণ্ডামত লোকটা টাল সামলাতে না পেরে ওলটানো টেবিলের ধাক্কায় মেঝেয় পড়ে গেল। পিটার একলাফে পিস্তলসুদ্ধু লোকটার হাতটা পায়ের বুট দিয়ে চেপে ধরল। লোকটার চোখ মুখ ব্যথায় বিকৃত হলো। কিন্তু সে পিস্তল ছাড়ল না। পিটার পায়ের চাপ বাড়াল। লোকটা পিস্তল ছেড়ে দিল। পিটার বাঁ পা দিয়ে পিস্তলটা চেপে রাখল। ডান পা লোকটার হাত থেকে তুলে নিল। লোকটা বাঁ হাতে ডান হাতটা চেপে ধরে আস্তে আস্তে মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল। পিটার এই সুযোগটাই চাইছিল। লোকটা কিছু বোঝার আগেই পিটার ওর থুত্নি লক্ষ্য করে ঘুঁষি চালাল। লোকটা ওঁক করে শব্দ তুলল মুখে, তারপর গোড়াকাটা গাছের মত চিৎ হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। আর নড়ল না।

পিটার দ্রুতহাতে পিস্তলটা তুলে নিল মেঝে থেকে। তারপর উল্টে-পড়া টেবিলের নিচে থেকে আহত রোগা লোকটাকে টেনে তুলল। লোকটা তখন জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে। পিটার বলল, ডান হাতটা দিয়ে আমার কাঁধটা জড়িয়ে ধরো। লোকটা তাই করল। পিটার ওকে জড়িয়ে ধরে যত দ্রুত সম্ভব দরজার দিকে ছুটল।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস পিটারের চোখে মুখে লাগল। ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামাল। দরজা খুলে রোগা লোকটাকে ঠেলে সিটে বসিয়ে দিল। তারপর নিজে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, হাসপাতাল চলুন। জলদি।

ড্রাইভার ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। একটু পরে রাস্তায় একটা বাঁক নিতেই পিটারের মাথায় হঠাৎ চিন্তা এল—গুলিতে আহত লোকটা। সরকারী হাসপাতালে গেলে অনেক জেরার মুখে পড়তে হবে। থানা পুলিশের ঝামেলায়ও পড়তে হতে পারে। ও ড্রাইভারকে বলল, ড্রাইভার—একটা কথা বলছিলাম।

—বলুন। ড্রাইভার রাস্তার দিকে চোখ রেখে মুখ না ফিরিয়ে বলল।

—আপনার জানাশোনা কোনো নার্সিং হোমটোম আছে?

—ঐ তো ঐ পেট্রল পাম্পটার পেছনেই আছে—কী নাম যেন নার্সিং ক্লিনিকটার।

—নামে দরকার নেই। সোজা ওখানে চলুন। জলদি।

রোগা লোকটা কঁকিয়ে উঠল। পিটার দেখল লোকটার বাঁ কাঁধের দিকে জামাটা রক্তে ভিজে গেছে। তখনও রক্ত পড়া বন্ধ হয় নি। পিটার পকেট থেকে রুমাল বের করে গুলিতে ক্ষত জায়গাটায় চেপে ধরল।

ক্লিনিকের সামনে এসে গাড়িটা জোর ঝাঁকুনি খেয়ে থামল। পিটার ট্যাক্সির ভাড়া মেটাল। তারপর গুলিতে আহত লোকটাকে ট্যাক্সি থেকে বের করে কাঁধে ধরে ধরে ক্লিনিকের সিঁড়ির দিকে এগোল। লোকটা তখন গোঙাতে শুরু করেছে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠতে ক্লিনিকের দুজন পুরুষ নার্স ছুটে এল। তাদের হাতে ছিল একটা ভাঁজ করা স্ট্রেচার। ওরা আহত লোকটাকে স্ট্রেচারটা খুলে পেতে তাতে শুইয়ে দিল। তারপর ক্লিনিকের ভেতরে নিয়ে গেল।

এতক্ষণে পিটার স্বস্তি পেল। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কত ঘটনা ঘটে গেল। এখন তার নিজেকে বড় ক্লান্ত মনে হলো।

আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে ক্লিনিকের অফিসে ঢুকল। একটা লম্বাটে বড় খাতা সামনে নিয়ে একজন বয়স্কা নার্স বসে আছে। পিটার তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, একজন আহত লোককে আমি নিয়ে এসেছি।

—জানি। তাকে আট নম্বর বেড-এ রাখা হয়েছে। এবার রোগীর নাম ঠিকানা, আপনার নাম ঠিকানা দিন।

পিটার নিজের আর হোটেলের নাম ঠিকানা দিল।

—রোগীর নাম ঠিকানা? নার্সটি বলল।

—জানি না।

নার্সটি পিটারের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। বলল, কিন্তু এটা তো লিখতে হবে ভর্তির খাতায়।

—আহত লোকটি তো এখনও অজ্ঞান হয়ে যায় নি। ওকেই জিজ্ঞেস করুন।

—বেশ। নার্সটি টেলিফোন তুলে নিল। কার সংগে ফোনে কথা বলল। একটুক্ষণ ফোন ধরে রইল। তারপর ফোন নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, নাম ঠিকানা পাওয়া গেছে।

—কী নাম লোকটার? পিটার জানতে চাইল।

—হাজুকা—হাইডা উপজাতির লোক। দেশ-গ্রাম ছেড়ে এখন এই ভিক্টোরিয়া শহরেই থাকে। ডক-এ কাজ করে।

—হাইডা উপজাতি কারা? পিটার জানতে চাইল।

নার্সটি মৃদু হাসল। বলল, আপনি বোধহয় নতুন এসেছেন

—হাঁ—বেড়াতে এসেছি।

—হাইডা উপজাতি হলো রেড ইণ্ডিয়ানদের একটা শাখা। এখান থেকে উত্তরে প্রায় সত্তর আশি মাইল দূরে হাইডারা থাকে। ওদের বড় বসতি হলো জিলুয়েট উপত্যকায়।

ওরা কথা বলছে তখনই একজন নার্স দ্রুতপায়ে এল। বয়স্কা নার্সটিকে বলল, আট নম্বর বেড-এর রোগীর সংগে কে এসেছেন? পিটার দু'পা এগিয়ে বলল, আমি।

—আপনাকে ডঃ নিকলসন ডাকছেন।

—চলুন। পিটার নার্সের পিছু পিছু চলল। চারদিক নিস্তব্ধ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। খুব সুন্দর বন্দোবস্ত। একটা ঘরে ঢুকল নার্সটি। পিটারও ঢুকল। সারি সারি সাদা ধপ্‌ধপে বিছানা বালিশ পাতা কয়েকটা বেড। আট নম্বর বেড-এর কাছে একজন এ্যাপ্রন পরা প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। দুজন নার্সও দাঁড়ানো সেখানে। পিটার দেখল হাজুকা চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। এর মধ্যেই ওকে হাসপাতালের নীল ডোরাকাটা পায়জামা ঢোলা শার্ট পরানো হয়েছে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে নার্সটি মৃদুস্বরে বলল,



পিটার থুত্নি লক্ষ্য করে ঘুষি চালাল।

ডঃ নিকলসন। পিটার একটু মাথা ঝুঁকিয়ে ডঃ নিকলসনের সামনে দাঁড়াল।

—আপনিই এই আহত লোকটিকে এনেছেন ?

—হ্যাঁ। পিটার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল।

—একটা পিস্তলের গুলি ওর কাঁধ থেকে বের করা হয়েছে।

—ও।

—গুলিটা পুলিশের পিস্তলের গুলি নয়। কাজেই গুরুত্ব দিচ্ছি না খুব। তবু সমস্ত ব্যাপারটা জানা দরকার। প্রয়োজনে আমরা পুলিশকে ডাকবো। আপনি কি ওর পরিচিত ? বন্ধু ?

পিটার মাথা নাড়ল। তারপর সমস্ত ঘটনাটা আস্তে আস্তে বলে গেল। ডঃ নিকলসন মাথা নিচু করে সমস্ত ঘটনাটা শুনলেন। তারপর মুখ তুলে বললেন, আপনি কোথায় থাকেন ?

পিটার ওর হোটেলের নাম বলল। তারপর বলল, আমি শিকাগো থেকে এখানে এসেছি। বেড়াতে।

ডঃ নিকলসন দুহাতের তালু ঘষে নিয়ে বললেন, আপনি একজন নিরীহ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছেন। কাজেই আপনাকে কোনো ঝামেলায় ফেলা উচিত হবে না। অবশ্য আপনার নাম ঠিকানা তো আমাদের কাছে রইলই।

পিটার একবার হাজুকার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, ও এখন কেমন আছে ?

—প্রাণের ভয় নেই। সপ্তাহ দুয়েক এখানে থাকতে হবে। ভালো হয়ে যাবে। তবে বাঁ হাতটায় আর আগের মতো জোর পাবে না।

—আমি ওকে কখন দেখতে আসতে পারি।

—যে কোনো সময়। অফিস থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড করিয়ে নেবেন।

—ধন্যবাদ। পিটার হাত বাড়াল। ডঃ নিকলসন হেসে করমর্দন করলেন।

ক্লিনিকের অফিস ঘরে এল পিটার। হাজুকার চিকিৎসায় খরচ অগ্রিম কিছু—সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ডলার জমা দিল। ভিজিটিং কার্ড নিল।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল পিটার। দেখল পূর্ব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। বাইরের অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। কয়েক পা হাঁটতেই একটা খালি ট্যাক্সি পেল। হোটেলে ফিরে এল যখন তখন হোটেলের বাগানের গাছে গাছে পাখি ডাকতে শুরু করেছে।

ঘরে ঢুকে পিটার জামা প্যান্ট না খুলেই শুয়ে পড়ল। শুধু জুতো জোড়া খুলে রাখল। মাথার কাছে রাখা ফোনটা তুলে নিল। লাইনের ওপার থেকে রিসেপশনিস্ট-এর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, বলুন।

—আমাকে কেউ যেন না ডাকে। প্রয়োজনে আমিই ডাকবো।

—আপনি যেমনটি চান। রিসেপশনিস্ট বলল।

পিটার হোটেলের মোটা কম্বলটা থুত্নি অব্দি টেনে দিল। ঘুম আসছে না। নানা চিন্তা ভিড় করে আসছে। হাজুকাকে নিয়ে ও এখন কী করবে। ক্লিনিকে অর্থ যা জমা দিয়েছে তাতে এক সপ্তাহ হাজুকাকে রাখতে ওরা আপত্তি করবে না। কিন্তু আরো বেশিদিন যদি হাজুকাকে থাকতে হয়, আরো খরচ তাহলে। না দিতে পারলে ক্লিনিকের লোকেরা অসুস্থ লোকটাকে হয়তো রাস্তায় নামিয়ে দেবে। ওটা তো সরকারী হাসপাতাল না। পিটার একবার ভাবল আমার কী দরকার এসব ঝামেলায় জড়ানোর। ওরা যা করার করুক। আমি আর ক্লিনিকে যাবো না। এসব ভাবতে ভাবতে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন পিটারের ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে প্রাতরাশ খেল।

একটু বেলার দিকে গরম জলে খুব ভালো করে স্নান করল। পেটপুরে দুপুরের খাওয়া খেল। তারপর মোটা কম্বলে মাথামুখ ঢেকে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যের কিছু আগে। বিছানা থেকে নেমে দু হাত ওপরে তুলে আড়মুড়ি ভাঙল। অনেক ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। সসেজ দিয়ে গোল রুটি খেল। তারপর এক কাপ কফি খেয়ে পোশাক পরে নিল। ক্লিনিকে আর যাবে না, এটাই সকাল পর্যন্ত ভেবে রেখেছিল। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে ওর মন পাল্টাল। একবার অন্তত হাজুকাকে দেখতে যাওয়া উচিত। এখন কেমন আছে সেটাও জানা উচিত। হোটেল থেকে রাস্তায় যখন নামল তখন রাস্তার ধারে, দুপাশের বাড়িঘর, দোকানে আলো জ্বলছে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে পিটার ক্লিনিকের দিকে চলল।

ক্লিনিকের সিঁড়ি বেয়ে যখন উঠছে তখনই নজরে পড়ল ক্লিনিকের নামটা। কক্সি ক্লিনিক। নামটা বেশ।

ভিজিটার্স কার্ড দেখিয়ে পিটার আট নম্বর বেড-এর কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল হাজুকা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। পিটার আস্তে আস্তে ডাকল, হাজুকা। প্রথম ডাক বোধহয় ওর কানে গেল না। আর একবার ডাকতেই হাজুকা চোখ মেলে তাকাল। একটু লালচে হয়ে উঠেছে চোখ দুটো। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ও পিটারকে চিনল। হাসল একটু। পিটার টুল টেনে ওর বিছানার পাশে বসল। বলল, এখন কেমন আছো ?

হাজুকা আস্তে আস্তে মাথা এপাশ ওপাশ করে বলল, ভালো।

—ওষুধ খাওয়া দাওয়া সব ঠিকমত দিচ্ছে তো ?

—হ্যাঁ। হাজুকা কম্বলের তলা থেকে ডান হাতটা বের করল।

পিটার ওর হাতে হাত রেখে চাপ দিল। হাজুকার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ও ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছ ভাই। তোমার ঋণ আমি কোনোদিন শোধ করতে পারবো না।

—ওসব কথা থাক। পিটার হেসে বলল। তারপর বলল,

আচ্ছা কী ব্যাপার বলো তো? ঐ লোকটা কে?

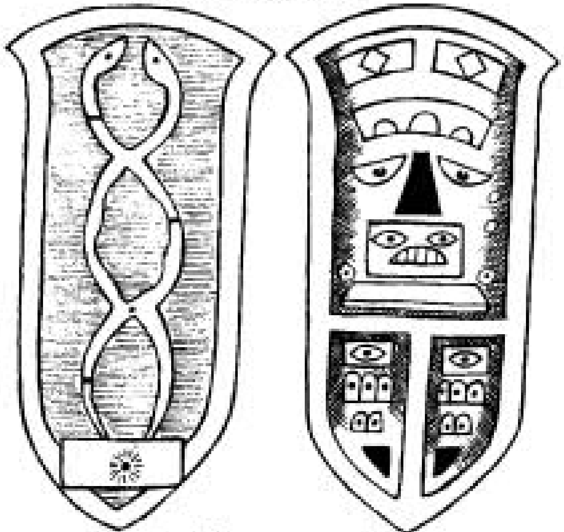
–ওর নাম আর্থার।

–তোমাকে মারতে চেয়েছিল কেন?

–সে অনেক কথা। তোমাকে সব কথা বলবো। তার আগে তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি–আর্থার যেন তোমার হদিস না পায়। আর্থার একটা পয়লা নম্বরের খুনে। ওর কাছে একটা মাছি মারা আর মানুষ হত্যা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

–ও কে?

–ও আসলে আমাদের হাইডা উপজাতির লোক। কিন্তু অনেকদিন আগে ও আমাদের দেশ-গাঁ ছেড়ে এই ভিক্টোরিয়ায় চলে এসেছে। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এখানকার গুন্ডাদলের সংগে মিশে কয়েকবার জেলও খেটেছে।



সর্পদেবীর তামার ফলক।

–তোমার সংগে শত্রুতা কীসের? পিটার জানতে চাইল।

–কারণ এই তামার ফলকটা। এই কথা বলে হাজুকা ডান হাতের জামার আস্তিনটা ওপরের দিকে গোটাল।

পিটার দেখল ওর বাহুতে বাঁধা একটা তামার ফলক। পিটার কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, এটা কী?

–এটা সর্পদেবীর বাহুতে বাঁধা থাকত, তার অলংকার এটা। আমাদের অত্যন্ত পবিত্র জিনিস। একটু থেমে বলল, হাত থেকে খুলে নিয়ে দেখ।

পিটার রূপোর সরু শেকলে বাঁধা তামার ফলকটা ওর বাহু থেকে খুলে নিল। দেখল প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা চাকতি মত। বিচিত্র সব কারুকাজ তাতে। ফলকটা ঘুরিয়ে অন্য পিঠটা দেখল। দুটো সাপ যেন জড়িয়ে আছে এরকম একটা অদ্ভুত নক্সা খোদাই করা। পিটার তামার ফলকটার এপিঠ ওপিঠ বারকয়েক দেখল। তারপর হাজুকাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, এটা তোমার কী কাজে লাগবে যীশুই জানে।

হাজুকা ম্লান হাসল, এটায় খোদাই করা নক্সাগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি নি। তবে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে সর্পদেবীর গুহার নির্দেশ আছে এর মধ্যে।

–সর্পদেবীর গুহা? পিটার বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল।

–সে সব পরে তোমাকে বলবো। এখন বড় দুর্বল লাগছে। কথা বলতে পারছি না। হাজুকা বলল।

পিটার উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম কর।

একটু পরেই পিটার ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। ভাবতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়? সমুদ্রের ধারে ধারে রাস্তাটা দিয়ে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়াল। গতকাল রাতের সেই রেস্তোরাঁটার কথা মনে পড়ল। খুব ভালো কফি করে ওরা। ওখানেই যাওয়া যাক্। এক কাপ কফি খেয়ে হোটেলে ফেরা যাবেখন।

রেস্তোরাঁটায় গিয়ে যখন পৌঁছল তখনও বেশি রাত হয় নি। বেশ ভিড় রেস্তোরাঁটায়। ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। চেয়ার খালি নেই। কপাল ভালো বলতে হবে। তখনই ওর সামনে একজন চেয়ার ছেড়ে উঠল।

পিটার দ্রুত ছুটে গিয়ে চেয়ারটায় বসে পড়ল। লক্ষ করল না যে এক কোণায় বসে আছে আর্থার। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। লক্ষ রাখছে কী করছে পিটার।

কফি খেয়ে রেস্তোরাঁর বাইরে এল পিটার। পকেট থেকে লাইটার বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে হোটেলে যাওয়ার রাস্তাটা ধরল। বেশি রাত হয় নি। তাছাড়া হাঁটতেও ভাল লাগছে।

হোটেলে ঢুকে ঘরের চাবিটা নিল। ঘরে এসে বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিল। কেমন গুমোট যেন ঘরটায়। বাইরে সমুদ্রের জোর হাওয়া ঘরে ঢুকল। গুমোট ভাবটা কেটে গেল।

গায়ের জামাটা খুলছে তখনই জানালার শার্শিটায় একটা জোরালো শব্দ শুনে পিটার ঘুরে দাঁড়াল। দেখল আর্থার খোলা জানালা থেকে লাফিয়ে মেঝের কার্পেটের ওপর দাঁড়াল। আর্থার কালো ছোপধরা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। আর্থারের হাতে পিস্তল নেই। তবে কোমরে ছোরাটোরা থাকা অসম্ভব নয়। পিটার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে জামাটা খুলতে খুলতে বলল, কী ব্যাপার চাঁদু, একেবারে হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করেছো?

–রেস্তোরাঁ থেকে তোমার পিছু নিয়েছি। আর্থার শান্তস্বরে বলল।

–তাই নাকি? পিটার অবাক হওয়ার ভঙ্গি করল, আশ্চর্য! আমি বুঝতেই পারি নি।

–বাজে কথা ছাড়ো। হাজুকাকে কোথায় রেখেছো?

–হাজুকা? পিটার অবাক হবার ভান করল, কে হাজুকা?

–কাল রাতে আমি যাকে গুলি করেছিলাম।

—ও সেই আহত লোকটা?

—হ্যাঁ, কোথায় সে?

—হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা কেটে পড়েছি।

—কোন হাসপাতালে?

—সরকারী হাসপাতালে।

—এখানে দুটো সরকারী হাসপাতাল আছে। কোনটাতে?

—সে আমি বলতে পারবো না। ট্যাক্সি ড্রাইভার সেখানে নিয়ে গিয়েছিল।

—হুঁ। হাজুকা সম্বন্ধে আর কিছু জানো না?

—বিন্দুবিসর্গও না।

—বেশ—আর্থার মাথা ঝাঁকাল, তোমার কথা সত্যি বলে মেনে নিলাম। যদি আমাকে ধাঁওতা দেবার চেষ্টা কর—তাহলে—

—বুঝেছি—পিটার ঘাড় কাত করে বলল, তারপর যেন কিছুই জানে না এমনি ভঙ্গিতে বলল, কিন্তু ঐ আধবুড়ো লোকটার ওপর তোমার এত রাগ কেন বাপু।

আর্থার আবার ছোপধরা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। বলল, পাঁচ-ছ লক্ষ ডলার কখনো চোখে দেখেছো?

—না। পিটার ঠোঁট ওলটাল।

—তুমি তো এখানে নতুন এসেছো। লিলুয়েট উপত্যকায় আছে সর্পদেবীর গুহা। সেখানে আছে ছ'সাত হাত লম্বা একটা সাপের মূর্তি। নিরেট সোনায় তৈরি। চোখ দুটো চুনিপাথরের। সারা গায়ে হীরে মুক্তোর টুকরো বসানো। ওটা চুরি করতে পারলে খুব কম করে ছ'লক্ষ ডলার তোমার পকেটে। বুঝেছো খোকা?

পিটার মাথা নেড়ে বলল, খুব বুঝেছি।

—হাজুকা সেই গুহায় ঢোকার হদিস জানে। সবসময় ও হাতে একটা তামার চাকতি পরে থাকে। ওটাতেই আছে সর্পদেবীর গুহায় ঢোকার নক্সা।

—এতক্ষণে বুঝলাম। পিটার বিছানায় বসতে বসতে বলল,—ঐ নক্সাটা তোমার চাই—এই তো।

আর্থার আর কোনো কথা বলল না। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

পিটার মৃদু হাসল। আসলে পিটার নিজেও একটি দলের সংগে যুক্ত। শিকাগো শহরে ওর আস্তানা। এক ভালো দাঁও মেরে বেশ কিছু ডলার ও পেয়েছিল। তাই ভ্যানকুয়ার দ্বীপে বেড়াতে এসেছে। গুণ্ডার দলে ওর খুব কদর।

জামাকাপড় ছেড়ে ও নিচে নেমে রাতের খাবার খেয়ে এল। তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল সর্পদেবীর গুহা আর সেখানকার ছ'লক্ষ ডলার দামের সাপের মূর্তির কথা। ও বুঝল এখানে ওকে আরো কিছুদিন থাকতে হবে। এরকম একটা দাঁও হাতছাড়া করা যায় না। হাজুকাকে হাতে রাখতে হবে। মূর্তি চুরি করতে গেলে ওর সাহায্য চাই। হাজুকাকে কথা বলাতে হবে। সব খবরাখবর নিতে হবে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পিটারের চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল।

পরের দিন বিকেলের দিকে তৈরি হয়ে চলল ক্লিনিকে হাজুকাকে দেখতে।

পথে যেতে যেতে ও বুঝল একটা খয়েরী ওভারকোট পরা লোক ওকে অনুসরণ করছে। পিটার এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল। পেছনের লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। পিটার উঠে দাঁড়িয়েই দ্রুতপায়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল। একছুটে দোকানের ভেতরটা পেরিয়ে গিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে একটা সরু গলিতে নামল। তারপরেই প্রায় ছুটতে ছুটতে বাঁ হাতি আরো ছোট একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। সেটা দিয়ে ছুটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। একটা চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটল। ও পেছনে তাকিয়ে দেখল সেই খয়েরী ওভারকোট পরা লোকটা ঠিক তখনই বড় রাস্তায় এসে উঠেছে। চারিদিকে তাকাচ্ছে লোকটা। পিটার মৃদু হেসে একটা সিগারেট ধরাল।

হাজুকাকে আজকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে। এটা ওটা জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করে ও বলল, হাজুকা, সর্পদেবীর গুহার ব্যাপারটা আমাকে একটু বলো তো?

—সব বলবো তোমাকে। তার আগে বলো আর্থার তোমার খোঁজ পেয়েছে?

পিটার সত্যি কথাটা চেপে গেল। বলে উঠল, নাঃ।

—হুঁ, হাজুকা বলল, ও কিন্তু সহজে আমাদের ছাড়বে না।

—সে দেখা যাবে'খন। তুমি সব কথা খুলে বলো।

—বেশ। হাজুকা মাথার বালিশটা উঁচু করে আধশোয়া হলো। তারপর বলতে লাগল, লিলুয়েট উপত্যকার পাশেই একটা পাহাড় আছে। খুব বেশি উঁচু নয়। আসলে এটা একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। এই পাহাড়ের একটা গুহার নাম সর্পদেবীর গুহা। প্রতি পূর্ণিমার রাতে এই গুহায় সর্পদেবী সবাইকে দর্শন দেয়। হাইডারা দলে দলে আসে। সর্পদেবীর উদ্দেশে ডলার সোনা রূপা যে যা পারে রেখে যায়। সর্পদেবীর পুজো করে যে প্রধান পুরোহিত তার নাম কারিবু। অসীম ক্ষমতা কারিবুর। সেই সর্পদেবীকে চালায়। কারিবু যা বলে সব হাইডারা মাথায় পেতে মেনে নেয়। —হাজুকা থামল।

—হুঁ। আচ্ছা এই সর্পদেবী কে?

—একটি মেয়ে। এই ভ্যানকুয়ার দ্বীপের যেখানে যেখানে হাইডাদের বসতি আছে সেসব জায়গা থেকে খুঁজে পেতে একটি মেয়ে নিয়ে আসে কারিবু। অনেক লক্ষণ মিলিয়ে আনা হয়। পূর্ণিমার রাতে যার জন্ম হয়েছে, মাথার চুলের রঙ যার সোনালী, গায়ের রঙ কালো, চোখ নীলাভ, এমনি অনেক লক্ষণ মিলিয়ে তবে সেই মেয়েকে সর্পদেবী করা হয়।

—এই সর্পদেবীর গুহায় আর কী আছে? পিটার বলল।

—একটা সাপের মূর্তি আছে।

—খুব দামী?

—কয়েক লক্ষ ডলার।



না, আপনার চিকিৎসা প্রিন্স দ্বীপের ওঝাই করবে।

–যে কেউ তো চুরি করতে পারে সেটা।

–অসম্ভব। সর্পদেবী যে বেদীতে এসে দাঁড়ায় তার পেছনে পাহাড়ের পাথুরে গায়ে ওটা আটকানো। বেদীর এপাশে গভীর খাদ। সেখানে গলিত লাভা গন্ধক ফুটছে। সেটা পেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

–তাহলে সর্পদেবী সেই বেদীতে আসে কী করে?

–মনে হয় পেছনে কোনো সুড়ঙ্গপথ আছে যেখান দিয়ে সর্পদেবী আর কারিবু আসে। কিন্তু সে পথের হদিস কারিবু ছাড়া আর কেউ জানে না।

–আচ্ছা–তুমি ঐ তামার অলঙ্কারটা পেলে কী করে? পিটার জানতে চাইল।

–সে অনেক কথা। আর একদিন তোমায় বলবো। হাজুকা ক্লান্তস্বরে বলল।

–না–আজকেই বলো। তোমার এখানে আমি কয়েকদিন পরে আসবো।

–কেন? আর্থার কি তোমার হদিস পেয়েছে?

–পেতে কতক্ষণ! ভিক্টোরিয়া তো শিকাগো শহরের মতো বড় নয়। আমাদের দুজনকেই সাবধান হতে হবে।

–তা ঠিক। হাজুকা বলল, তবে শোন। প্রায় বছরখানেক আগের কথা। একদিন গভীর রাতে হঠাৎ দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে তখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি চলছে। দরজা খুলে দিতেই একটি হাইডা মেয়ে ঢুকল। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে মেয়েটি। দু এক পা এগিয়েই মেয়েটি মেঝেয় পড়ে গেল। তখনি বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোয় চিনলাম মেয়েটিকে। সেই লালচে চুল। নীলচে চোখ। সর্পদেবী। আমি তো ভয়ে কাঠ। এত রাত্রে সর্পদেবী আমার ঘরে। আমি তাড়াতাড়ি সর্পদেবীকে পাঁজাকোলা করে তুলে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। একটা কম্বল ওর গায়ে জড়িয়ে দিলাম। নিজে মেঝেয় একটা হেমলক গাছের বাকলে তৈরি চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। শেষে রাত্রির দিকে ঝড়বৃষ্টি কমে গেল। হঠাৎ সর্পদেবী গোঙাতে শুরু করল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে ওর কাছে গেলাম। তখন সর্পদেবী সারা গা মোচড়াচ্ছে আর ছটফট করছে। আমি বললাম, আপনার কী হয়েছে? সর্পদেবী গোঙাতে গোঙাতে বলল, পেটে অসহ্য

ব্যথা। আঁ–আঁ–

আমি বুঝলাম এই দ্বীপের মারাত্মক রোগটি সর্পদেবীকে ধরেছে। এই রোগটা হলো আমাশা। আমি এখানে কিছুদিন ডাক্তারি পড়েছিলাম। সরকার থেকে আমাদের এসব সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু পড়া চালাতে পারি নি। বাবা অথর্ব হয়ে পড়ল। আমাকে তামার খনিতে মজুরের কাজ নিতে হলো। আধুনিক ওষুধপত্র আমি জানতাম। আমার ঘরেও ওষুধপত্র রাখতাম। অনেকেই আমার কাছে ওষুধের জন্যে আসত। মারাত্মক আমাশার ওষুধ আমার কাছে ছিল। দুটো বড়ি সর্পদেবীকে খাইয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে সর্পদেবীর ছটফটানি বন্ধ হলো। একসময় গোঙানিও থেমে গেল।

সকাল হলো। সর্পদেবীর ঘুম ভাঙল তখন। দেখলাম অনেকটা সুস্থ তখন। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?

কারিবু আমাকে প্রিন্স দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল। এক খুব বড় ওঝা আছে ওখানে। তাকেই দেখাতে। দেখিয়ে ক্যানো নৌকো করে ফিরছি তখনই ঝড়জল শুরু হলো। কারিবুর নৌকো কোথায় ভেসে গেল। আমাদের নৌকো ডুবে গেল। আমি সাঁতরে কোনো রকমে তীরে এলাম। তারপর তোমার এখানে।

–এখন কেমন আছেন?

–ভালো। পেটের ব্যথাটা নেই বললেই চলে। আচ্ছা তুমিই আমাকে ওষুধ দাও না। তোমার ওষুধ খেয়ে অনেক উপকার হয়েছে আমার।

আমি বললাম, –কিন্তু কারিবু কি রাজী হবে?

–আমি বলবো।

–দেখুন বলে।

দুপুর নাগাদ পাঁচজন দেহরক্ষী নিয়ে কারিবু এসে হাজির। সর্পদেবীকে অনেকটা সুস্থ দেখে কারিবু খুব খুশি হলো। সর্পদেবী তখন কথাটা বলল। কারিবু মাথা নেড়ে বলল, না, আপনার চিকিৎসা প্রিন্স দ্বীপের ওঝাই করবে। সর্পদেবী বারবার বলল যে আমার ওষুধ খেয়ে ও সুস্থ হয়েছে, আমার ওষুধ খেলেই ওর অসুখ সেরে যাবে। কিন্তু কারিবু রাজী হলো না। সিডার গাছের ডাল দিয়ে তৈরি মাচার মতো এনেছিল ওরা। তাতে সর্পদেবীকে বসিয়ে ওরা নিয়ে গেল। হাজুকা থামল।

পিটার বলল, তারপর কী হলো?

–কিছুদিন পরে কারিবু ওর দেহরক্ষী পাঠাল। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। হাজুকা বলতে লাগল, কারিবু ডেকে পাঠিয়েছে, না গিয়ে উপায় নেই। গেলাম দেহরক্ষীর সঙ্গে। সর্পদেবীর বাসস্থান আমরা কেউ জানতাম না। কারিবু আর তার পাঁচজন দেহরক্ষী শুধু জানে সর্পদেবী কোথায় থাকে। ওরা আমাকে সেই বাড়িতে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে দেখি সর্পদেবী কাঠের মাচায় শুয়ে আছে। শরীর শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। কারিবু মাচার বিছানার পাশেই বসেছিল। আমি কারিবুকে মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কারিবু বলল, দেখ, অনেক ভেবে দেখলাম সর্পদেবীকে একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পারো। আজ থেকে তুমিই ওর চিকিৎসা করবে। আমি আস্তে আস্তে বললাম, আমার জ্ঞানবুদ্ধিমত চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবো না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্পদেবীকে সুস্থ করতে পারবো কি না জানি না।

–চেষ্টা করে দেখ–কারিবু বলল, সর্পদেবী নির্বাচন যে কী কঠিন কাজ সে তোমরা কিছু কিছু জানো। কাজেই যে করেই হোক এই সর্পদেবীকে বাঁচাতে হবে। কারিবু একটু থেমে বলল, আর একটা কথা। সর্পদেবী যে অসুস্থ একথা যেন কেউ না জানে। আর পনেরো দিন পরে পূর্ণিমা, সেদিন যেন সর্পদেবী দর্শন দিতে পারে। হাজুকা থামল।

–তারপর? পিটার বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনতে লাগল।

–আমি চিকিৎসা শুরু করলাম। আমাদের কাছে আমাশা সবচেয়ে প্রাণঘাতী রোগ। বেশির ভাগ হাইডা এই রোগে মারা যায়। যাহোক, ভিক্টোরিয়া থেকে ভালো ওষুধ কিনে নিয়ে গেলাম। আমাকে খরচ টরচ সব কারিবু দিত। দিন দশেকের মধ্যে সর্পদেবী অনেকটা সুস্থ হলো। পূর্ণিমার দিন গুহায় হাইডাদের দর্শনও দিল। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই সর্পদেবী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। পরীক্ষা করেই বুঝলাম আর বাঁচবার আশা নেই। সারারাত প্রচণ্ড ব্যথায় সর্পদেবী ছটফট করল। শেষ রাত্রির দিকে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ল। ওর মধ্যেই দুর্বল স্বরে আমাকে বলল, গয়নার বাক্সটা নিয়ে এসো।

ওটা শিয়রের কাছে রাখা ছিল। আমি এনে দিলাম। বাক্স থেকে তামার এই অলংকারটা আমাকে দিয়ে বলল, তুমি আমার জন্যে অনেক করেছো। কিন্তু আমি আর বাঁচবো না। তোমাকে এই পবিত্র অলংকারটা দিলাম। এটাতে একটা ধাঁধা আছে। যদি সমাধান করতে পারো তবে সর্পদেবীর বেদীতে তুমি যেতে পারবে। সোনালী সাপের মূর্তি তখন তোমার হাতের মুঠোয়। সেই মূর্তি বিক্রি করতে পারলে তোমার পরের তিন পুরুষ রাজার হালে জীবন কাটাতে পারবে।

আমি তাড়াতাড়ি তামার অলংকারটা কোমরে গুঁজে রাখলাম। ভোরের দিকে সর্পদেবী মারা গেল। হাজুকা থামল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। পিটারও একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, কারিবু কি আবার সর্পদেবী যোগাড় করেছে?

–হাঁ। তবে তাকে আমি দেখি নি।

–আচ্ছা পূর্ণিমা কবে? পিটার জিজ্ঞেস করল।

হাজুকা জামার আস্তিন গোটাল। সেই তামার চাকতিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। বলল, দশ দিন পরে। তার মানে আজ সাত তারিখ, সামনের সতেরো তারিখ। এই অলংকারে মাসের হিসেব আছে।

আমি সেদিন সর্পদেবীর গুহায় যাবো। সব নিজের চোখে

দেখে তবে বুঝবো তোমার তামার চাকতিটার ধাঁধাটা কী।

—বেশ তো, চলো লিজুয়েট উপত্যকায় আমাদের গাঁয়ে। কিন্তু আমাকে লুকিয়ে যেতে হবে।

—কেন ?

—নতুন সর্পদেবী যেদিন দর্শন দেবার কথা সেদিনই তার অলঙ্কারের কারুকাজ করা বাক্সটা খোলা হয়েছিল নিশ্চয়ই। তখনই ধরা পড়েছিল যে বাহুর তামার অলঙ্কারটা খোয়া গেছে। কারিবু আমাকেই সন্দেহ করেছিল। ওর দেহরক্ষী পাঠিয়েছিল আমাকে ধরবার জন্য। আমি বিপদ আঁচ করে সেইদিন রাত্রেই পালালাম। এই ভিক্টোরিয়া শহরে চলে এলাম।

—আচ্ছা হাজুকা—তোমার ঐ অলঙ্কারটা এক রাত্রির জন্য আমাকে দেবে ?

হাজুকা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, তুমি আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছো। তবু তোমার এ অনুরোধ আমি রাখতে পারবো না। সর্পদেবীর অলঙ্কার আমাদের কাছে খুব পবিত্র জিনিস।

—ঠিক আছে—পিটার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি দুদিন পরে আসবো। তখন ওটার নকল এঁকে নেব।

পিটার ক্লিনিকের বাইরে এসে দাঁড়াল। দেখল রাস্তায় বেশি গাড়ি বাস চলছে না। একটু রাত হয়েছে।

দুদিন পরে পিটার আবার ক্লিনিকে এল। কিন্তু আর্থারের লোক ওকে ঠিক অনুসরণ করল। পিটার এ-গলি সে-গলিতে ঢুকে, এক ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে লোকটাকে বোকা বানাল। কিন্তু আর্থার সেদিন বুদ্ধি করে দুজন লোক লাগিয়েছিল। একজনকে ঝেড়ে ফেললেও অন্য লোকটা ঠিক পিটারকে অনুসরণ করল। ও যখন ক্লিনিকটায় ঢুকছে তখন ক্লিনিকের নাম, হাজুকার বেডনম্বর সব জেনে নিয়ে গেল। পিটার এসবের কিছুই জানতে পারল না। ও তখন একমনে হাজুকার সেই তামার অলঙ্কারের নক্সাগুলো একটা বড় নোট বইয়ে এঁকে নিচ্ছে। দুপিঠের নক্সাই আঁকল। আঁকা শেষ হলে ভালো করে মিলিয়ে নিল। আসলে পিটার অপরের সই জাল করতে সিদ্ধহস্ত। ঐ গুণটি এখানে খুব কাজে লেগে গেল। নোটবইটা বন্ধ করে পিটার বলল, আচ্ছা, আর্থারের ব্যাপারটি কী বলো তো ?

হাজুকা বলতে লাগল—সী ভিউ রোডে একটা ঘর নিয়ে আমি থাকতাম। আর্থার থাকতো আমার পাশের ঘরে। হঠাৎ একদিন আমার অসাবধানতার জন্য এই তামার চাকতিটা দেখে ফেলে। ও তো হাইডা। ঠিক বুঝল সর্পদেবীর অলঙ্কার এটা। ও প্রথমে অলঙ্কারটা ভালো করে দেখতে চাইল। আমি দিলাম না। ও তারপর জবরদস্তি শুরু করল। আমি সেই আস্তানা ছেড়ে পালালাম। কয়েকদিন একটা পোড়ো বাড়িতে লুকিয়ে রইলাম। কিন্তু খিদের জ্বালায় বেরোতে হলো। তাই সেদিন রাত্রে রেস্তোরাঁটায় খেতে গিয়েছিলাম। তারপর তো তুমি সবই জানো।

—হুঁ। যাক গে তুমি তো অনেক সুস্থ এখন। সামনের পূর্ণিমার রাত্রে আমাকে সর্পদেবীর গুহায় নিয়ে যেতে পারবে ?

—নিশ্চয়ই পারবো।

পিটার আর কোনো কথা বলল না। আর কোথাও না গিয়ে সোজা হোটেলে চলে এল।

দুতিন দিন পিটার আর ওমুখো হলো না। সমুদ্রে স্নান করে, ওয়াটার স্কি করে, সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিল। তার পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আবার ক্লিনিকের দিকে চলল। বেশ অবাক হলো যখন দেখল কেউ ওকে অনুসরণ করছে না। কী ব্যাপার ? আর্থার এত তাড়াতাড়ি হাল ছেড়ে দিল ?

ক্লিনিকে হাজুকার বেড-এর কাছে যেতেই ওকে দেখে হাজুকা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। পিটার অবাক। বিছানায় বসে জিজ্ঞেস করল, কী হলো ? কাঁদছো কেন ?

হাজুকা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, আর্থার সেই তামার অলঙ্কারটা নিয়ে গেছে।

—আশ্চর্য! তুমি এখানে আছো জানলো কী করে ?

—কীভাবে জানলো জানি না। কাল রাত্রে এ ঘরে এসে হাজির। বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে অলঙ্কারটা চাইল। ক্লিনিকের লোকেরা ওর হাতে পিস্তল দেখে কেউ এগোতে সাহস করল না। আমি মিথ্যে করে বললাম পিটারকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ও বিশ্বাস করল না। প্রথমে জামা গুটিয়ে বাহু দেখল। ওটা তখন বাঁধা ছিল না। ও জানে আমি শোবার সময় কোথায় রাখি ওটা। ও বালিশ ওল্টাতেই ওটা পেয়ে গেল। ওর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল। অলঙ্কারটা পকেটে নিয়ে ও চলে গেল।

—কিচ্ছু ভেবো না। ওটায় খোদাই করা সব নক্সা আমার নোট বইয়ে নকল করা আছে। এখন কাজের কথায় এসো। ডাক্তাররা কবে তোমাকে ছেড়ে দেবে বলছে ?

—সকালেই বড় ডাক্তার বলে গেছে আমাকে কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেব।

—এখন বলো তো লিজুয়েট উপত্যকায় পৌঁছতে আমাদের কতদিন লাগবে ?

—কীসে যাবে ?

—একটা জীপ ভাড়া করবো।

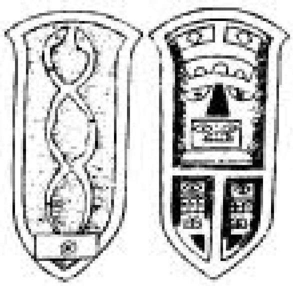
—তাহলে দিন দেড়েকের মাথায় আমরা ওখানে পৌঁছে যাবো।

—হুঁ। চৌদ্দ তারিখ আমাদের রওনা দিতে হবে অর্থাৎ আর চার দিন পরে। তোমার কাঁধের অবস্থা কেমন ? পারবে যেতে ?

—ঘা তো শুকিয়ে এসেছে। তবে বাঁ হাতটায় তেমন জোর পাচ্ছি না।

—তাতে কোনো অসুবিধে হবে না। আমি তো আছি। আর কিছুক্ষণ হাজুকার সংগে গল্পগুজব করে পিটার হোটেলে ফিরে এল।

পরের দুটো দিন পিটার আর হোটেল থেকে বেরোল না। সেই তামার অলঙ্কারের নক্সাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এটা ও বুঝল যে সর্পদেবীর গুহায় ঢোকার পথের নিশানা রয়েছে পেছনের জোড়াসাপের নক্সাটার মধ্যে। ও খুঁটিয়ে দেখল দুটো সাপের মত আঁকাবাঁকা দুটো পথের ইঙ্গিত রয়েছে। পথগুলো মাঝে মাঝে বন্ধ আঁকা আছে। সেই বন্ধ জায়গাগুলো এড়িয়ে যেটা সঠিক পথ সেটা পিটার বের করে ফেলল। কিন্তু সবশেষে রয়েছে একটা চতুর্ভুজ আঁকা। পথ ওখানেই শেষ। চতুর্ভুজের মাঝখানে একটা বিন্দু। ওটার চারপাশে যেন আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে এরকম দাগ।



পিটার বুঝল এই চতুর্ভুজের বাধাটা পেরোতে পারলেই সর্পদেবীর বেদীতে পৌঁছানো যাবে। কিন্তু এই বাধা কীভাবে পেরোনো যাবে।

ও অনেক রাত অব্দি এই ধাঁধার সমাধান ভাবল। কিন্তু কোনোটাই সঠিক সমাধান মনে হলো না। তখন স্থির করল গুহার শেষে ও জায়গাটায় পৌঁছে সব দেখে সমাধানটা ভাবতে হবে। চোখে না দেখে কিছু ভাবা যাবে না।

ও আর রাত না করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

দুদিন পরে হাজুকা ক্লিনিক থেকে ছাড়া পেল। পিটারই ক্লিনিকের সব পাওনা মিটিয়ে দিল। হাজুকাকে সঙ্গে নিয়ে ওর হোটেলে এল।

পরদিন পিটার একটা জীপ ভাড়া করল। একটা তাঁবু, কয়েক দিনের মত খাবার দাবার, পেট্রল, জলের পাত্র, এরকম প্রয়োজনীয় সব কিছু জীপটায় তুলে রাখল।

চৌদ্দ তারিখ প্রাতরাশ খেয়ে ওরা জীপ ছেড়ে দিল। রওনা হলো লিলুয়েট উপত্যকার উদ্দেশে।

ষোল তারিখ সন্ধেবেলা ওরা লিলুয়েট উপত্যকায় পৌঁছল। হাইডাদের গ্রামের কাছাকাছি জঙ্গলের আড়ালে ওরা তাঁবু ফেলল। আসার পথে কোনো ঝামেলায় পড়তে হয় নি। শুধু ঠান্ডাটা বেশি পড়েছিল। বাক্স থেকে গরম কাপড়, সোয়েটার, কম্ফর্টার এসব বের করতে হয়েছে। গায়ে দিতে হয়েছে। পথে আর্থারও ওদের কোনো বিপদে ফেলার চেষ্টা করে নি। আর্থার যা চেয়েছিল তা পেয়ে গেছে। কাজেই ওদের দিকে ওর আর নজর নেই।

এখন সর্পদেবীর গুহায় যাওয়ার জন্যে হাইডাদের পোশাক চাই। হাজুকা সেদিন সন্ধ্যের অন্ধকারে নিজের বাড়ি গেল। লুকিয়ে হাইডাদের দুটো পোশাক নিয়ে এল। সাদা কালো ডোরাকাটা পোশাকগুলো চলচলে।

সতেরো তারিখ সন্ধ্যের মধ্যেই পিটার আর হাজুকা খেয়েদেয়ে তৈরি। একটু রাত হতেই হাইডাদের পোশাক পরে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

পরিস্কার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিকের বনের গাছপালা, ঝোপ। পায়ে চলা পথ পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। দলে দলে হাইডারা যাচ্ছে। ওদের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

প্রায় মাইলখানেক দূরে। লিলুয়েট পাহাড়ের তলায় পৌঁছল ওরা। পিটার হাতঘড়িতে দেখল পৌনে ন'টা। সর্পদেবীর গুহার সামনে গিয়ে পৌঁছল ওরা। হাইডাদের দলের সঙ্গে মিশে ওরা গুহার মধ্যে ঢুকল। গুহার এখানে ওখানে মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল গুহাটা বেশ বড়। কিছুটা এগোতেই দেখা গেল বিরাট গহ্বর একটা। তাতে গলিত লাভা গন্ধকের স্তর। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাত পর্যন্ত এই গহ্বর। গলিত লাভা থেকে লালচে আলো বেরোচ্ছে। ওটার পরেই একটা পাথরের বিরাট বেদী। বেদীর ওপাশে পাথুরে দেয়ালে আটকানো রয়েছে একটা ফণা মেলে ধরা সাপের মূর্তি। তার দুপাশে দুটো মশাল জ্বলছে। তারই আলোতে দেখা যাচ্ছে সেই মূর্তিটা। সাপটা সোনার। তার ওপর পাথর বসানো। পিটার দেখেই বুঝল ঐ পাথরগুলো অত্যন্ত দামী। সাপের মুখ থেকে সোনার কাটা জিভ বেরিয়ে আছে। চোখ দুটো নীল পাথরের। পিটার অবাক হয়ে দেখছিল সাপের মূর্তিটা। মশালের আলোয় ঝকমক করছিল মূর্তিটা। ও বুঝল, আর্থার মিথ্যে বলে নি। মূর্তিটার দাম ছ লক্ষ ডলারের বেশিই হবে। পিটার চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। নাঃ। ঐ মূর্তির কাছে বেদীতে পৌঁছোবার কোনো উপায় নেই। সামনেই গলিত লাভার গহ্বর। দুপাশে নিরেট পাথুরে দেয়াল। গহ্বর পার হবার কোনো উপায় নেই। গলিত লাভার হাত পাঁচেক কাছে যা রাখা যাবে তাই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গহ্বরের এপাশে দেহরক্ষীরা দাঁড়িয়ে। হাতে কাঠের বল্লম। কাঁধে তীর ধনুক।

দর্শনার্থী হাইডাদের সঙ্গে পিটার আর হাজুকা বসে রইল। গহ্বর থেকে একটা হলদে সাদা ধোঁয়া উঠে আসছে। সেই ধোঁয়া মাঝে মাঝে সর্পদেবীর বেদীটা ঢেকে দিচ্ছে। গুহার ভেতরটা বেশ গরম।

হঠাৎ একটা গম্ভীর শব্দ উঠল গুহাটায়। হাইডারা সব উঠে দাঁড়াল। দু হাত ওপরে তুলে তারা চিৎকার করে কী বলে উঠল। হাজুকা চাপাস্বরে পিটারকে বলল, দু হাত তোলো। হাজুকা নিজেও দুহাত তুলল। পিটারও তুলল। পিটার চাপাস্বরে বলল, ওরা কী বলছে ?

—বলছে সর্পদেবীর জয়। সর্পদেবী এখনি বেদীতে আসবে।

তখন মাথা নিচু করবে। তারপর সবার সংগে বসে পড়বে।

পিটার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বেদীর পেছনের পাথুরে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। কোথা দিয়ে সর্পদেবী আসবে? ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে পাথুরে দেয়ালটা। ওর মধ্যেই পিটার আবছা দেখল বাঁদিকে কোণাটায় একটা পাথরের খাঁজ বড় হচ্ছে। পাথরটা সরে যাচ্ছে। পাথরটা আরো সরে গেল। সর্পদেবী ঢুকল। পেছনে পেছনে ঢুকল—একজন বলিষ্ঠদেহী পুরুষ। পিটার হাজুকাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, ঐ লোকটা কে?

—প্রধান পুরোহিত—কারিবু। হাজুকা নিচু স্বরে বলল।

কারিবুর গায়ে একটা কালো সাদা ডোরাকাটা চাদর আলগাভাবে জড়ানো। গায়ের রঙ তামাটে। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখে পাতলা দাড়িগোঁফ।

পিটার এবার সর্পদেবীকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। ঠিকই মেয়েটির গায়ের রং কালো। মাথার চুল লালচে। চোখ দুটো ভালো দেখা যাচ্ছে না। নাকে নোলক। গলায় ঝুলছে তিন চারটে পাথরের মালা। পরনে সোনালী জরির কাজ করা কালো সাদা ডোরাকাটা পোশাক।

সর্পদেবী বেদীর ওপর গিয়ে দাঁড়াল। হাইডারা কেউ কেউ সোনার অলংকার বেদীর ওপর ছুঁড়ে দিতে লাগল। কেউ কেউ ভাঙানিও ছুঁড়ে দিতে লাগল। কেউ কেউ ডলারের নোট পাথরের টুকরোয় জড়িয়ে ছুঁড়ে দিল।

হাইডারা এবার বসে পড়ল। এবার কারিবু এগিয়ে এল। চিৎকার করে দ্রুত বক্তৃতার ঢং-এ কী বলতে লাগল। পিটার হাজুকাকে ফিসফিস করে বলল, কী বলছে?

—বলছে সাপের পবিত্র মূর্তি চুরি করার চেষ্টা চলছে। বিদেশীরা বিধর্মীরা এই চেষ্টা চালাচ্ছে। দুঃখের কথা, লোভে পড়ে কিছু হাইডাও এই দলে জুটেছে। তোমরা কোনো বিদেশী দেখলেই সর্পদেবীর দেহরক্ষীদের খবর দেবে। হাজুকা ফিসফিস করে বলে গেল। পিটার গায়ের চাদরটা নাক অব্দি টেনে দিল। মাথার দিকেও চাদরটা ভুরু অব্দি টেনে দিল।

কারিবু হঠাৎ বক্তৃতা থামিয়ে দ্রুতহাতে বেদীতে যে সোনার গয়না, খুচরো, ডলারের নোট পড়েছিল সেসব তুলে নিল। তারপর বেশ দ্রুতপায়েই পেছনের দিকে হাঁটতে লাগল। সর্পদেবী এতক্ষণ নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল। তাকে কারিবু হাত তুলে ইঙ্গিত করল। সর্পদেবী দ্রুত বেদী থেকে নেমে কারিবুর



পিটার ডান হাতে কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল।

পেছনে পেছনে চলল। ধোঁয়ার আড়ালে ওরা মিলিয়ে গেল। হাইডারা চিৎকার করে সর্পদেবীর জয়ধ্বনি দিল। তারপর সবাই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল।

পিটার ওর হাইডাদের পোশাকের নিচে প্যান্টের পকেট থেকে হাতঘড়িটা বের করল। হিসেব করে দেখল। সর্পদেবীর ও কারিবুর বেদীতে আসা, বক্তৃতা, গয়না কুড়িয়ে দ্রুত ফিরে যাওয়া, এতে সময় লেগেছে পনেরো মিনিটের মতো পিটারের এটা একটু অদ্ভুত লাগল। কারিবু ফিরে যাওয়ার সময় এত তাড়াহুড়ো করছিল কেন? কথাটা ভাবতে ভাবতে পিটার গুহার বাইরে এল। হাজুকাও এল। ঠিক তখনই একজন দেহরক্ষী পিটারের দিকে এগিয়ে এল। পিটার আর মুখ ঢাকার অবকাশ পেল না। দেহরক্ষীটিও সেই চাঁদের আলোয় পিটারের মুখ দেখে বুঝল বিদেশী। কিন্তু দেহরক্ষীটি হাতের কাঠের বর্শাটা বাগিয়ে ধরার আগেই পিটার দ্রুতহাতে কোমরে গোঁজা ছোরাটা বের করল। দেহরক্ষীটি কিছু বোঝার আগেই আমূল ওর পেটে ঢুকিয়ে দিল। রক্ষীটি 'অঁক' করে মুখে একটা শব্দ করে পেট চেপে বসে পড়ল। পিটার দ্রুত চারদিক দেখে নিল। দেখল হাইডারা দল বেঁধে পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছে। কাছাকাছি দুজন হাইডা যাচ্ছে। তাও ওরা সামনে। পিটার রক্ষীটির পিঠে লাথি মারল। রক্ষীটি গড়িয়ে সামনের ঝোপঝাড় ভেঙে খাদে পড়ে গেল। চোখের সামনে মানুষ খুন হতে দেখে হাজুকা ভয়ে কাঁপতে লাগল। পিটার ওর শরীরটা ধরে ঝাঁকুনি দিল। ফিসফিস করে বলল, দু'লক্ষ ডলার হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় না। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। চলো।

ওরা বনের আড়ালে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে এল। পিটার বলল, হাজুকা—খাবার দাবার বার কর। দু কাপ কফির জল বসিয়ে দাও। রান্নাবান্নার দরকার নেই। কৌটোর খাবারই খাবো। হাজুকা ঝোলা থেকে খাবার দাবার বের করল। ছোট্ট স্টোভটা জ্বেলে কফি করল।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে পিটার নোটবইয়ে আঁকা নক্সাটা দেখতে লাগল। দুটো সাপ যেন জড়িয়ে আছে। তার মানে দুটো সুড়ঙ্গ পথ। হঠাৎ নিচের দিকে একটা জোড়ার কাছে দেখল কালো বিন্দু একটা। বুঝল এটা কোনো গর্ত হবে। তার পাশ দিয়েই পথ। পিটার পেন্সিলের দাগ দিয়ে যে পথে যাবে সেই পথটা ছকে নিল।

ততক্ষণে খাবার বের করা হয়ে গেছে। দুজনে খেতে লাগল। হাজুকা খেতে খেতে বলল, কী ভাবছো পিটার?

—সুড়ঙ্গপথের সমাধান করেছি। কিন্তু শেষেরটা পারি নি। যাকগে—আর দেরি নয়। আজকেই যাবো। তৈরি হয়ে নাও।

—আজকেই?

—হ্যাঁ। অনেকেরই নজর আছে ঐ সাপের মূর্তিটার ওপর। তাছাড়া কারিবু বুঝতে পেরেছে ঐ মূর্তি চুরি করার জন্য বিদেশী লোকেরা উঠে পড়ে লেগেছে।

—শেষ বাধাটা কী? হাজুকা জানতে চাইল।

—সেটা ওখানে না পৌঁছে বলতে পারবো না। এই বাধা কাটাবার পথ শুধু কারিবু জানে।

—সর্পদেবী?

—না। জানে না। তাকে বোধহয় চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয়।

—তা ঠিক। নইলে আগের সর্পদেবী আমাকে সমাধানটা বলতে পারতো। চলো, আর দেরি নয়।

পিটার কোমরে পিস্তল আর ছোরাটা গুঁজে নিল। বাক্সমত বড় ব্যাটারির টর্চটা নিল।

ওরা যখন সিলুয়েট পাহাড়ের পেছনটায় পৌঁছল তখন বেশ রাত হয়েছে। চাঁদের আলোয় একটা গুহা ওরা দেখল। পিটার চাঁদের আলোয় নক্সার সংগে মেলাল। না। এই গুহা একটু গিয়েই বন্ধ হয়ে গেছে। আর একটা গুহা আছে। সেটা খুঁজতে লাগল। ঐ গুহাটার সমান্তরালে বাঁ দিকে খুঁজতে লাগল। ঝোপঝাড় সরিয়ে খুঁজতে খুঁজতে জংগলের আড়ালে গুহার মুখ পেল। টর্চ জ্বালিয়ে ভেতরে ঢুকল। টর্চের আলো যতদূর পৌঁছল দেখল টানা সুড়ঙ্গ চলে গেছে। ওরা কয়েকটা চাঁই পাথর পেরিয়ে চলল। পিটার যেতে যেতে নক্সাটা মিলিয়ে নিচ্ছে। ও আগেই সঠিক সুড়ঙ্গপথটা পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রেখেছিল। কাজেই পাথরের চাঁই আর টুকরো টুকরো পাথর ছড়ানো পথ দিয়ে ওরা চলল বিনা বাধায়। চারিদিকে নিস্তব্ধ। দুজনে দুজনের শ্বাস পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এক সময় এক ঝাঁক বাদুড় ডানা ঝাপটে গুহার মধ্যে দিয়ে উড়ে গেল। তারপর আবার নিস্তব্ধ চারিদিক।

আর একটা সুড়ঙ্গ এসে যেখানে মিলেছে সেখানেই দেখল বেশ বড় একটা গর্ত। আর তার পাশ দিয়ে যাওয়ার মতো রাস্তা আছে। পিটার নক্সায় দেখল ওখানে কালো ফুটকি মতো অর্থাৎ এখানে একটা গর্ত আছে। গর্তটা পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই হঠাৎ সুড়ঙ্গ পথ শেষ হয়ে গেল। সামনেই চৌকোণো পাথরের একটা ছোট দেয়ালের মতো। পিটার পাথরের ছোট দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে রইল। টর্চটা মাটিতে বসিয়ে আলোটা দেয়ালের ওপর ফেলল। তারপর দেয়ালটা ঘুরে ঘুরে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কীভাবে এটা সরানো যায় বুঝল না। তবে দেয়ালের ধারগুলো দেখে বুঝল এটা সরে যায়। কিন্তু কী করে? ও বারকয়েক ধাক্কা দিল। হাজুকাকে ডেকে দুজনে মিলে ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু পাথুরে দেয়াল অনড়। পিটার লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরাল। আবার নক্সাটা খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল নক্সাটায় এখানে আলো ছড়িয়ে পড়ার মত আঁকা আছে। পিটার টর্চটা দেয়ালের কাছে নিয়ে এল। কিন্তু দেয়াল অনড়। নক্সাটা আবার ভালো করে দেখতে গিয়ে দেখল দেয়ালের মাঝখানে একটা ছোট্ট অস্পষ্ট বিন্দু। ও দেয়ালের ঠিক মাঝখানে দেখল সত্যি ও জায়গাটায় একটু গর্তমত। মনে হয় কিছু দিয়ে যেন ওখানে আঘাত করা

হয়েছে। তখনি নজর পড়ল ঠিক গর্তমত জায়গাটার নিচেই একটা গোল পাথর পড়ে আছে। পিটার একমুহূর্ত ওটার দিকে তাকিয়ে রইল। বিদ্যুৎচমকের মতো একটা ঘটনা ওর মনে খেলে গেল—সর্পদেবী আর কারিবু বেদীতে ঢোকার আগে একটা গম্ভীর শব্দ হয়েছিল। দুহাত ওপরে তুলে পিটার চেঁচিয়ে উঠল, আলো নয়—শব্দ। তারপরই নিচু হয়ে গোল পাথরটা হাতে তুলে নিল। হাজুকা হাঁ করে পিটারের পাগলামি দেখতে লাগল। পিটার দুহাতে গোল পাথরটা তুলে পাথুরে দেয়ালের ঠিক মাঝখানটায় গর্তমত জায়গাটায় এক ঘা মারল। প্রচণ্ড শব্দ উঠল সুড়ঙ্গটায়। দেখা গেল দেয়ালটা কাঁপছে থরথর করে। আস্তে আস্তে দেয়ালটা নেমে আসতে লাগল। ফাঁক দেখা গেল। ফাঁকটা বড় হতে লাগল। তখনও দেয়ালটা কাঁপছে। বেশ কিছুটা ফাঁক হতেই উল্লাসে নোটবইটা ছুঁড়ে ফেলে পিটার ছুটে গিয়ে ফাঁকটা দিয়ে ঢুকে পড়ল। হাজুকাও খুশিতে লাফিয়ে উঠল। পিটারের ছুঁড়ে দেওয়া নোটবইটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। তারপর সেও ছুটে ঢুকে পড়ল।

ভেতরে সর্পদেবীর বেদীতে এসে দাঁড়াল পিটার। দুপাশে মশাল জ্বলছে। পেছনে তাকিয়ে দেখল সেই গলিত লাভার খাদ। তারপর গুহার মুখ। সামনে তাকিয়ে দেখল পাথুরে দেয়ালে লোহা দিয়ে আটকানো সাপের মূর্তি। ছুটে গিয়ে মূর্তিটার গায়ে হাত দিল। সারাটা গা সোনার। কত দামী পাথর গায়ে বসানো। ফণা তোলা জীবন্ত সাপ যেন।

হঠাৎ হাজুকার কথা মনে হলো। দেখল হাজুকা বেদীর নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে মুখে ভীষণ ভয়ের ছাপ। পিটার ডাকল, এসো হাজুকা, দুজনে হাত না লাগালে হবে না।

হাজুকা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। চিৎকার করে বলল, না—না। আমার অভিশাপ লাগবে। আমি এখান থেকে চলে যাবো। একদৃষ্টিতে সাপের মূর্তির চোখের দিকে তাকিয়ে ও একথা বলল। পিটারের মাথায় খুন চেপে গেল। হাজুকা যদি পালাতে পারে তাহলে সমূহ বিপদ। ও নিশ্চয়ই গ্রামে ফিরে মূর্তি চুরির কথা বলবে। পিটার আর মূর্তি নিয়ে পালাতে পারবে না। এত দামী একটা মূর্তি হাতছাড়া হয়ে যাবে। শিকাগোর নামকরা গুণ্ডা পিটার আসল চেহারা ধরল। কোমর থেকে পিস্তল বের করে তাক করল হাজুকার দিকে। বিপদ আঁচ করে হাজুকা ছুটতে যাবে, পিটারের পিস্তলের গুলি ওর বুকে গিয়ে লাগল। গুলির প্রচণ্ড শব্দে গুহাটা কেঁপে উঠল যেন। হাজুকা একটা পাক খেয়ে গলা লাভার খাদটায় পড়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ওর চিহ্ন আর রইল না। সেইসঙ্গে পিটারের নোটবইটাও গলিত লাভায় তলিয়ে গেল। পিটার পিস্তলটা কোমরে গুঁজে মূর্তিটা জোরে টানতে লাগল। মূর্তিটা একটু নড়ল। কিন্তু খুলে এল না। ও মূর্তিটা টানাটানি করছে, তখনই হঠাৎ গুলির প্রচণ্ড শব্দে গুহাটা আবার কেঁপে উঠল। গুলিটা ওর মাথার পাশ দিয়ে গিয়ে সাপের মূর্তির গায়ে লাগল। দুটো পাথরের টুকরো ছিটকে গেল। পিটার বিপদ বুঝে মুহূর্তের মধ্যে এক লাফে বেদীর পেছনে গিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে আরো গুলির শব্দ হলো। কিন্তু দ্রুত লাফিয়ে পড়ার জন্যে পিটার বেঁচে গেল। বেদীর আড়ালে বসে ও কোমর থেকে পিস্তল বের করল। ধোঁয়ায় ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবু বুঝল গুহায় ঢোকার সেই দরজার সামনের পাথরটার আড়াল থেকে কেউ গুলি চালাচ্ছে। পিটার সেইদিকে লক্ষ করে গুলি চালাতে লাগল। ওদিক থেকেও গুলি ছুটে আসতে লাগল। বেদীতে পাথুরে দেয়ালে গুলি লাগছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে পিটার আবছা দেখতে পেল গুহায় ঢোকার সেই দরজাটার ফাঁক অনেকখানি কমে গেছে। পিটারের চিন্তাটা নাড়া খেল। কেন কারিবু সর্পদেবীকে নিয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল? কেন দরজাটা ছোট হয়ে আসছে? ও সেদিন হিসেব করে দেখেছিল বেদীতে সর্পদেবী আর কারিবু মাত্র পনের মিনিট ছিল। তবে কি পনের মিনিট পরেই দরজাটা বন্ধ হয়ে যায়? ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল দরজার ফাঁক আরো একটু কমেছে।

পিটার চিৎকার করে বলল, কে তুমি? কথাটা গুহাটায় প্রতিধ্বনিত হলো।

—আমি তোমার পুরোনো বন্ধু—আর্থার। আর্থার হেসে উঠল।

—তুমি কী করে এখানে এলে?

—বন্ধু তুমিই তো পথ দেখিয়ে নিয়ে এলে।

—তুমি কী চাও?

—সাপের মূর্তিটা।

—বেশ নিয়ে যাও। এই আমি পিস্তল ফেলে দিচ্ছি। পিটার হাতের পিস্তলটা বেদীর ওপর গড়িয়ে দিল। বলল, এবার তোমারটা ফেল। আর্থারও পিস্তলটা বেদীর ওপর ছুঁড়ে ফেলল।

দুজনে উঠে এসে বেদীর ওপর দাঁড়াল। আর্থার কালো ছোপধরা দাঁত বের করে বলল, শেষ সমাধানটা আমার বুদ্ধিতে কুলোয়নি। নইলে এসে দেখতে সব ভোঁ-ভাঁ। কথাটা শেষ করে ও কাঁধের ঝোলাটা নামাল। হাতুড়ি শাবল বের করল। পিটার বলে উঠল, শেষ পর্যন্ত তুমিই এটা পেলে।

—হ্যাঁ, অনেক খাটুনি গেছে তোমার। তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম করো গে। তার মানে আর্থার সব জানে।

পিটার আর দাঁড়াল না। ছুটে দরজার কাছে এল। দেখল দরজার ফাঁক আরো ছোট হয়ে গেছে। ও দ্রুত ডান পাটা গলিয়ে দিল। তারপর শরীরটা। দরজার ওপাশে চলে গেল ও। তখনি দরজাটা আরো ছোট হয়ে গেল। ওখান থেকে ও শুনল আর্থারের শাবলের ঘা-এর শব্দ।

ওদিকে শাবল চালিয়ে চালিয়ে আর্থার মূর্তিটা পাথুরে দেয়াল থেকে আলগা করে ফেলল। তারপর কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দিতেই মূর্তিটা দেয়াল থেকে খুলে এল। পাথরের টুকরো

ধুলোয় গড়িয়ে পড়ল। আর্থার মূর্তিটা কাঁধে তুলে নিল। বেশ ভারি মূর্তিটা। পিস্তলটা ছুটে বেদী থেকে তুলে নিল। কোমরে গুঁজল। তারপর হা হা করে হেসে উঠল। সমস্ত গুহায় সেই হাসি প্রতিধ্বনিত হলো।

কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছেই ওর খুশির ভাব মিলিয়ে গেল। কোথায় দরজা? নিরেট পাথরের দেয়াল সেখানে। ভয়ে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ও সাপের মূর্তি রেখে ছুটে গিয়ে শাবল নিয়ে এলো। এলোপাথাড়ি শাবল চালাতে লাগল। কিন্তু শক্ত নিরেট পাথরে শাবলের ঘা লাগাতে আগুনের স্ফুলিংগ ছিটকোল শুধু। দেয়াল অনড়। আর্থার বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল।

এদিকে পিটার সহজেই বুঝল আর্থারের অবস্থাটা। ও দেখল পায়ের কাছে বাক্স ব্যাটারির টর্চটা তখনও জ্বলছে। ও ঠিক করল। পাথরের ঘা দিয়ে দরজা খুলে দেবে। আর্থার দরজা পেরোলেই ওর মুখে টর্চের আলো ফেলবে। হঠাৎ জোরালো আলো চোখে পড়লে ও হকচকিয়ে যাবে। তখনই পিটারই ছুরি চালাবে।

পিটার চৌকোণো পাথরের মাঝখানে গোল পাথরটা দিয়ে ঘা দিল। গম্ভীর শব্দ উঠল গুহাটায়। দেয়ালটা থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপর সরে যেতে লাগল। মানুষ ঢোকার মতো ফাঁক হতেই মূর্তিটা কাঁধে নিয়ে ডান হাতে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে আর্থার একলাফে দরজা পেরিয়ে এপাশে এল। পিটার তৈরিই ছিল। টর্চটা ঘুরিয়ে ওর মুখে ফেলল। আর্থার চমকে উঠে গুলি চালাল। টর্চটা খান খান হয়ে ভেঙে গেল। হঠাৎ সব অন্ধকার। পিটার ছোরা হাতে অন্ধকারেই আর্থারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক কাঁধে ওরকম ভারি মূর্তি, আর হঠাৎ এই অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আর্থার টাল সামলাতে পারল না। পাথুরে মেঝেয় পড়ে গেল। পিস্তলটাও হাত থেকে ছিটকে গেল। পিটার এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। ও ছোরাটা আর্থারের বুকে বিঁধিয়ে দিল।

অন্ধকারের মধ্যে পিটার কিছুক্ষণ বসে বসে হাঁপাতে লাগল। তারপর অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে সাপের মূর্তিটা তুলে নিল। কাঁধে তুলল। কয়েক পা এগিয়েই ও দাঁড়িয়ে পড়ল, কোনদিকে যাবে? নক্সা? নোটবই? আলো চাই। সিগারেট লাইটারটা আছে। ও প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট লাইটারটা বের করল। জ্বালল। সেই আলোতে



দরজার কাছে খুঁজল কিছুক্ষণ। এখানেই কোথাও নোটবইটা ও ছুঁড়ে ফেলেছিল। না। কোথাও নেই। এদিকে লাইটার বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখতেও পারছে না। অল্প পেট্রল। কতক্ষণ আর জ্বলবে। অথচ এখন একমাত্র এই লাইটারটাই ভরসা। নক্সা পাওয়া গেল না। আচ্ছা—আর্থারের কাছে তো সেই তামার অলংকারটা থাকতে পারে। ও মৃত আর্থারের জামা-প্যান্টের পকেট তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তামার অলঙ্কারটা পেল না। পেল আর্থারের কোমরে গোঁজা ওর পিস্তলটা। সেটা নিয়ে লাইটারের মৃদু আলোয় সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলল। আস্তে আস্তে। নক্সার কিছুই মনে নেই। আন্দাজেই চলল। কাঁধে সাপের মূর্তি। হাতে লাইটারের মৃদু আলো। একটু পরেই দ্রুত পা চালাল। লাইটারের আলো বেশিক্ষণ পাওয়া যাবে না। সামনেই দেয়াল। ভুল পথ। আবার ফিরে এল। অন্য সুড়ঙ্গপথ ধরল। আলো কমে আসছে। দ্রুত ছুটল। সামনেই খাদ। সামলাতে গিয়েও পারল না। মূর্তি কাঁধে সোজা খাদে পড়ে গেল। একে মূর্তির ভার, তার ওপর এত উঁচু থেকে পা পিছলে পড়া। ডান পায়ের হাঁটুটায় জোর ঘা লাগল। অন্ধকারে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পারল না। বসে পড়ল। হাঁপাতে লাগল।

তখনি একটা ঠান্ডা শিরশিরে হাওয়া পিটারের গায়ে লাগল। ঠান্ডা কী যেন ওর গায়ের ওপর উঠে আসছে। আর একটা। আর একটা পায়ের দিকে। লাইটারটা তখনও হাতে রয়েছে। নিভে গেছে ওটা। পিটার লাইটার জ্বালল। সাপ? সেই মৃদু আলোয় দেখল অসংখ্য সাপের চকচকে গা। সাপগুলো ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছে। গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করছে। আতঙ্কে পিটারের বুক হিম হয়ে গেল। থরথর করে হাতটা কাঁপতে লাগল। সেই সঙ্গে লাইটারটাও। আলোও কাঁপছে। অত সাপের নিঃশ্বাসের শব্দ ওর কানে এল। ও শিউরে উঠল। দ্রুত উঠতে গেল। পারল না। হাঁটুতে অসহ্য ব্যথা। তবু পালাতে হবে। ও বাঁ পাটা হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে পাথুরে দেয়ালের কাছে গেল। লাইটারের কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখল খাড়া উঁচু দেয়াল। বুঝল এখান থেকে মুক্তি নেই। তখনই দেখল এখানে ওখানে কতকগুলি নরকঙ্কাল। পিটার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। পর পর কয়েকটা সাপের কামড় ও দাঁত চেপে সহ্য করল। হঠাৎ উন্মত্তের মতো কোমরে গোঁজা পিস্তলটা বের করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দ উঠল সুড়ঙ্গ পথে, গর্তটায়। গুলি শেষ। পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলল পিটার। নিকষ অন্ধকার চারদিকে।

শরীর বেয়ে কেমন একটা ঠান্ডা স্রোত বুকের দিকে উঠে আসছে। অবশ হয়ে আসছে শরীরটা। পিটার আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

ছবি : অলয় ঘোষাল



back to content



অনিল ভৌমিক এর জন্ম হয় ১৯৩২ সালের ব্রিটিশ ভারতের বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রামে। তাঁর বাল্যকাল এবং প্রথম যৌবন কেটেছিল ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর শহরে। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গার সময় তিনি দেশত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল অফিসে পেশাগত জীবন শুরু করেন। এরপর তিনি এই চাকরি ছেড়ে শিক্ষকতার পেশা গ্রহন করেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলে এমএ বিটি। তিনি আকাশবাণীতে বিখ্যাত লেখকদের গল্প উপন্যাসের বেতার নাট্যরূপ লিখেছেন। 'পরাশর রায়' এই ছদ্মনামে তিনি আকাশবাণীর তালিকাভুক্ত গীতিকার। তিনি একজন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। তিনি মূলত তাঁর সৃষ্ট কাল্পনিক চরিত্র ফ্রান্সিস এবং তার বন্ধুদের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর জন্য বিখ্যাত।